আব্দুল বায়েস

অভ্যন্তরীণ অভিপ্রয়াণ এবং অভিপ্রায়

এক.

অর্থনৈতিক সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ অভিপ্রয়াণ (Internal Migration) অতি পুরনো এক পদ্ধতি। কত পুরনো তা হয়তো বলা যাবে না, তবে প্রায় ১০০ বছর আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *পথের পাঁচালী* উপন্যাস—যা সত্যজিৎ রায় কর্তৃক ১৯৫৫ সালে চিত্রায়িত—কিঞ্চিৎ ধারণা দেয় বলে বিশ্বাস।

অধিক উপার্জনের আশায় তথা একটা ভালো জীবনের স্বপ্ন সাধনে পুরোহিত হরিহর রায় গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। পেছনে পড়ে থাকে সহধর্মিণী সর্বজয়া, মেয়ে দুর্গা আর ছেলে অপুকে নিয়ে তার প্রাণপ্রিয় পরিবার। বাড়ি ছাড়ার আগে কথা দেয় হরিহর, ফিরে এসে জীর্ণ ঘর মেরামত করবে। একদিন সে এসেছিল বটে, তবে শহর থেকে সঙ্গে আনা শখের জিনিস দেখাতে গিয়ে শুনতে পায় যে তাদের মেয়ে দুর্গা প্রচণ্ড জ্বরে মারা গেছে। এবার কন্যা হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে অর্থনৈতিক দৈন্য দূর করতে পৈতৃক ভিটা ফেলে পরিবারসহ গরুর গাড়িতে করে শহরমুখী হয় হরিহর।

আচ্ছা, ওই সময়ে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে যদি খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বর্ধনশীল উপার্জনের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে কি হরিহর গ্রাম ছেড়ে শহরে যেত?

দুই.

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) কাজী ইকবাল, নাহিদ ফেরদউস পাবন, রেজায়ানুল হক এবং নাহিয়ান আজাদ সসি এমন একটা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। সম্প্রতি তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অভিপ্রয়াণের (এখন থেকে অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন) ওপর চিত্তা উদ্দীপক নীতি-সংক্রান্ত এক প্রবন্ধ পেশ করে ওই প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন। মহাপরিচালক বিনায়ক সেনের সঞ্চালনায় পরিচালিত সেমিনারের শিরোনাম ছিল 'স্থানীয় খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সুযোগ এবং অভিপ্রয়াণ সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশের লক্ষণ'। অন্য কথায়, স্থানীয়ভাবে সংগঠিত এসব কর্মকাণ্ডের বিস্তার ব্যক্তি ও খানার অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করে কিনা এবং করে থাকলে নীতিমালা-সংক্রান্ত পদক্ষেপ কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। অতীতে এ ধরনের আলোচনা যে একেবারে হয়নি, তা বলা যাবে না। তবে নিতান্তই এনেকডটাল বা কেস স্টাডি-ভিত্তিক পর্যালোচনা। রোবাস্ট ইকোনমেট্রিক টুলস ব্যবহার করে চোখ ধাঁধানো (এবং চুল পাকানো) কার্যকারণ সম্পর্কিত আলোচনা আলোয় তেমন একটা এসেছে বলে অন্তত আমার মনে হয় না।

তিন.

সেই স্বাধীনতার শুরু থেকে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন যে বাড়ছে তার প্রমাণ দিতে বোধ করি পরিসংখ্যানের প্রয়োজন পড়ে না। শহরগুলোয় স্ফীত জনসংখ্যা, গিজগিজে গলিতে মানুষের স্রোত, গ্রামে আধুনিক যন্ত্রে চাষবাস, ঈদ বা লকডাউনে জীবন বাজি রেখে বাড়ি ফেরার তাগিদ ইত্যাদি ইঙ্গিতবাহক বলে মনে করা যায়। তার পরও পরিশুদ্ধ অর্থনীতিবিদ পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য ২০০৩ সালে প্রকাশিত বিআইডিএসের রীতা আফসারের প্রবন্ধ থেকে বলা যায়, মোট মাইগ্রেশনের দুই-তৃতীয়াংশ গ্রাম থেকে শহরে, এক-দশমাংশ গ্রাম থেকে গ্রামে এবং এক-চতুর্থাংশ দেশের বাইরে অভিবাসিত। আরো জানা যায়, ১৯৭৪ থেকে এখন পর্যন্ত লাইফটাইম মাইগ্রেশনের তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে পল্লীর অবকাঠামো উন্নয়ন সাপেক্ষে অকৃষি কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে তার প্রভাব অপরিমেয়। বস্তুত এখন গ্রামীণ খানার সিংহভাগ আয় আসে অকৃষি তথা খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে, যা ক্রমে ঊর্ধ্বমুখী, কৃষির চেয়ে অধিকতর উৎপাদনশীলতা ও আয় সঞ্চারক। যেমনটি আগে ভাবা হতো, এ ধরনের কাজ আর রেসিডুয়াল প্রকৃতির নয়, নয় পেশাগত শেষ আশ্রয়স্থল।

তবে গল্পের পেছনেও গল্প থাকে। বাংলাদেশের খামারে সবুজ বিপ্লবের কারণে (এবং অবশ্যই গ্রামীণ রাস্তাঘাট) অকৃষি তথা খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটেছে। খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের কাঠামো বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে যে এখনো পল্লী অঞ্চলে থাকা মোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষিপণ্য ও সেবা সম্পর্কিত। অতএব, এ ধরনের আলোচনায় নায়ক না হোক, অন্তত পার্শ্বচরিত্র হিসেবে খামারের ভূমিকার উল্লেখ থাকা উচিত।

চার.

গবেষকরা বলছেন, মাইগ্রেশন গ্রামীণ শ্রমবাজারে প্রভাব ফেলে শ্রমিকস্বল্পতা, মজুরি বাড়ায়, যা খাদ্যের দাম বাড়ায়। এক অধ্যয়নে দেখা যায়, মাইগ্রেশন ভর্তুকি দ্বারা উসকানো ইমিগ্রেশনে গ্রামে পুরুষ শ্রমিকের মজুরি ৫-৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে এবং তার ফলে খাদ্যের দাম প্রায় ৩ শতাংশ ওপরে ওঠে। কেউ বলেন, কৃষি শ্রমিকের স্বল্পতার কারণে পতিত জমির হিস্যা বৃদ্ধি পায় (যান্ত্রিক কৃষির ব্যাপক ব্যবহারের কথা কেন উঠল না, তা বুঝতে অক্ষম এই অধম)।

সেকথা থাক। মৌসুমভিত্তিক ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি নীতিমালা অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন উৎসাহিত করতে পারে বলে গবেষকরা মনে করেন। এক পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, মাত্র ৫০০ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান নমুনা খানার ২২ শতাংশে অন্তত একজন মৌসুমি মাইগ্রেন্ট পাঠাতে উৎসাহিত করেছে। তবে উচ্চহারে পল্লী-নগর মাইগ্রেশনের প্রতিকূল প্রভাব অজানা থাকার কথা নয়; যেমন শহুরে শ্রম, জমি ও বাড়ি-বাজারে বাড়তি চাপ, গণসেবার ওপর চাপ, ভিড়, শহুরে অর্থনীতির পঙ্কিল পরিবেশ ইত্যাদি।

> গবেষকদের সুপারিশ হচ্ছে, কর্মী যেখানে বাস করেন তার কাছাকাছি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। যদি খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের আয়ের হিস্যা বেশি থাকে, তবে খানার সদস্যের মাইগ্রেট করার চান্স কম থাকবে। অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসএমই গুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ বেশি যেখানে, সেখান থেকে অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা কম

পাঁচ.

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে সহজ কথা যায় না বলা সহজে।' খামার কর্মকাণ্ড ও আয়ের সম্পর্ক আপাতদৃষ্টে সহজ মনে হলেও বাস্তবে এর ব্যাখ্যাটা বেশ জটিল। আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খামারের আয় সাধারণত খামারবহির্ভূত আয়ের চেয়ে অধিকতর অস্থিতিশীল; বাংলাদেশে জলবায়ুজনিত প্রভাবে মাথাপিছু প্রকৃত কৃষি আয় এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কমে গেলে বাইরে যাওয়ার হার ১-২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বস্তুত মাইগ্রেশন ও গ্রামীণ খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড উভয়ই দুটো গুরুত্বপূর্ণ 'পেরে ওঠার' পদক্ষেপ বা কোপিং কায়দা হিসেবে দেখাটা ভালো।

এ পরিপ্রেক্ষিতে লেখকদের হাইপোথিসিস হচ্ছে এ রকম : যেহেতু গ্রামীণ অকৃষি কর্মকাণ্ড জলবায়ু নির্ভরশীল কৃষির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে এবং তাই আয় ওঠানামা কমায়, সেক্ষেত্রে অধিক খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড শহর-গ্রাম মাইগ্রেশন কমিয়ে আনতে পারে। কিন্তু এটা পরিষ্কার এবং সরলরৈখিক নয়। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় পর্যায়ে এসব কর্মকাণ্ড কম থাকলে খানার সদস্য মাইগ্রেট নাও করতে পারেন। কারণ চাকরি, মজুরি সম্পর্কিত অসম্পূর্ণ তথ্যপ্রবাহ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে; অভিভাবকহীন সন্তানরা মানব পুঁজি উন্নয়নে মা-বাবার অবদান বঞ্চিত হওয়ার ভয় থাকে; টেস্ট স্কোর ও কগনিটিভ উন্নয়ন কম হয় এবং স্বাস্থ্য ও মনোজাগতিক নেতিবাচক প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। এবং সবশেষে, 'ও সখিনা গেছস কিনা ভুইল্লা আমারে, আমি অহন রিকশা চালাই ঢাহা শহরে' জাতীয় গানে বেদনার জায়গাটুকু অভিপ্রয়াণের অভিপ্রায় ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা হলেও অবদমন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় নন-ফার্ম কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মাইগ্রেশন ঘটে মূলত অর্থবহির্ভূত সুবিধার জন্য, যেমন শহরে ভালো কাজের পরিবেশ, পুরো পরিবার নিয়ে অধিকতর ভালো জীবনযাপনের সম্ভাবনা (হরিহর রায়!), এমনকি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল এলাকায় বসবাস করে ওপরে ওঠার ব্যয়সাশ্রয়ী সিঁড়ির সন্ধান পাওয়ার সুযোগ ইত্যাদি। সুতরাং গ্রামীণ নন-ফার্ম আয়ের প্রভাব দুই দিকেই কাটতে পারে—অর্থশাস্ত্রের আপ্ত বাক্য অন দি ওয়ান হ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ডের পথ ধরে।

ছয়.

ইউনিয়ন পর্যায়ে ম্যাপিং করে গবেষকরা দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের আগের তুলনায় পশ্চিম দিকে খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীকরণ বেশি, অথচ পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে মাইগ্রেন্টের কেন্দ্রীকরণ অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে। সম্ভবত এটা প্রমাণ করে যে ইউনিয়ন পর্যায়ে খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ও মাইগ্রেশন প্রকোপের সম্পর্ক নেতিবাচক (এবং এ পার্থক্য সৃষ্টিতে সবুজ বিপ্লবতাড়িত খামারের ভূমিকা আছে কিনা দেখা দরকার)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রবৃদ্ধি এবং কল্যাণ সবচেয়ে অনুকূল করতে শিল্প-কারখানার আঞ্চলিক বিন্যাস কী হওয়া উচিত? যদি পর্যাপ্ত উৎসাহ দেয়া যায়, গবেষকদের ধারণা পল্লী অঞ্চলে স্থাপিত একটা পোশাক তৈরির কারখানা গুণক ও দারিদ্র্য হ্রাস প্রভাবে ঢাকার চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকবে (তা বটে, তবে শিল্পের কেন্দ্রীভূতকরণ উপাদ্যটিও মাথায় রাখতে হবে)। লকডাউনের সময় বাড়িগামী কিংবা ঢাকাগামী মাইগ্রেন্ট কর্মীদের অবর্ণনীয় কষ্ট যে ইঙ্গিত দিতে চায় তা হলো, বিপুলসংখ্যক কর্মী বাড়ি থেকে অনেক দূরে কাজ করেন বলে এই মানবিক সংকট। উন্নত দেশে নাকি অমন হয় না (তাই বুঝি? আমরা জানি যে ১০০ কিলোমিটার ট্র্যাভেল করে অফিস করে বাড়ি ফিরে যায় একমাত্র উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে। তাছাড়া এমন মানবিক সংকট হরহামেশাই হয়ে থাকে হরতাল, অবরোধ, পরিবহন সংকট ইত্যাদির কারণে)।

সুতরাং গবেষকদের সুপারিশ হচ্ছে, কর্মী যেখানে বাস করেন তার কাছাকাছি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। যদি খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের আয়ের হিস্যা বেশি থাকে, তবে খানার সদস্যের মাইগ্রেট করার চান্স কম থাকবে। অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসএমই গুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ বেশি যেখানে, সেখান থেকে অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা কম। তার মানে এসএমইর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতিসংক্রান্ত তাৎপর্য

শহরে আসার মানব মিছিল বন্ধ করতে হলে স্থানীয় স্তরে খামারবহির্ভূত কাজের সুযোগ চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

স্থানীয় বাজার, হাটসহ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পল্লীতে ইউনিয়ন পর্যায়ে শিল্প এলাকা স্থাপনে গণবিনিয়োগ, গ্রামের কাছে দ্বিতীয় শহর গড়ে তোলা। মূল প্রশ্ন, শিল্পের কাছে শ্রমিক যাবে নাকি শ্রমিকের কাছে শিল্প যাবে? দ্বিতীয়টি ব্যয়বহুল বিধায় ব্যাপক গণবিনিয়োগ দাবি করে।

এমন একটা অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপস্থাপনার জন্য গবেষকদের ধন্যবাদ। আশা করি, নীতিনির্ধারক মহল সুপারিশে নজর দেবে এবং মানুষের আয় উন্নতি ঘটাবে, কলকারখানা শ্রমিকের সন্নিকটে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে মানবসংকট দূর করবে।

কিন্তু গ্রাম যদি শহর বনে যায় তখন?

'মানুষ কী চায় উন্নতি, না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কী হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—এখন আর কিছুতেই আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো...রস ঢুকিতে পায় না।' (আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

আব্দুল বায়েস : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও অর্থনীতির অধ্যাপক, বর্তমানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক